২ অক্টোবর ২০২২

আশিস কুমার কুন্ডু

আমি আশিস। জন্ম বাংলাদেশে, ১৯৭৬ সালের ১০ নভেম্বর। এখন ইংল্যান্ড আর বাংলাদেশ -দুইটাই আমার দেশ। আমি দুই দেশেরই নাগরিক।

নরউইচে আসবার আগে লোস্টফ্টে থাকতাম। তারও আগে ছিলাম সাউথ এন্ড। আর প্রথমে এ দেশে এসে-উঠেছিলাম লন্ডনে। সে সব অনেক দিন আগের কথা। তখন ২০০৩ সাল।

অনেক আগে কাজের প্রয়োজনে সাউথ এন্ড থেকে যখন কোলচেস্টারের দিকে যেতাম, তখন অনেক সময় স্টেশনে দেখতাম নরউইচ মুখি ট্রেন দাড়িয়ে আছে। নরউইচে আসার আগে নরউইচ সম্পর্কে ঐটুকুই ধারণা ছিল আমার।

আমি সমুদ্রের ধারে থাকতে ভালোবাসি। সাগড়ের ঢেউ আমার মনকে দোলা দেয়। সাগরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাস আমার হৃদয়কে শুদ্ধ করে। তাই যখন ডাক্তারি ট্রেনিং-এর জন্য এদেশে আবেদন করতাম, খুঁজে খুঁজে সমুদ্র পাড়ের হাসপাতালগুলোকে চাইতাম।

সেভাবেই সাউথ এন্ড আর লোস্টফ্টে আমার থাকা। এগুলো সমুদ্রের ধারের শহর। আর এই শহরগুলোর লোকাল হাসপাতালে আমার চাকরি। নরউইচ, লোস্টফ্টের সবচেয়ে কাছের বড় শহর। ইংরেজিতে একে সিটি বলে। নরউইচে শপিং করতে আসতাম। কখনো কখনো বেড়াতে। কালে কালে এখানের অনেক বাঙ্গালির সাথে পরিচয়, অনেকে বন্ধুস্থানীয়ও হয়ে গেল। তাদের বাড়িতে যাওয়া হল নানা অনুষ্ঠান-উছিলায় কিংবা কখনো কখনো উপলক্ষ্য ছাড়াই। পরিবারের সাথে পরিবারের বন্ধুত্ব হল।

নরউইচ আমার কাছে পুরো যুক্তরাজ্যের শ্রেষ্ঠ শহরগুলোর অন্যতম সুন্দর শহর বলে মনে হয়। বেশ ছিমছাম এই ছোট শহরে প্রয়োজনীয় সব রকম নাগরিক সুযোগ-সুবিধা আছে। আবার সেই সাথে আছে প্রচুর গাছপালা ঘেরা শান্ত- নিস্তরঙ্গ- গ্রামীণ স্নিগ্ধতার ছোঁয়া। দেখেশুনে ভালো লাগলো, ঠিক করলাম এখানেই থেকে যাব। না, ভালো লাগলো বলব না, আসলে নরউইচকে আমি ভালোবাসি। ভালোবাসি এখানকার বন্ধুদের, গাছ-গাছালি, দালান-কোঠা - সবকিছুই। তাই একসময় লোস্টফ্ট ছেড়ে নরউইচকে ঠিকানা বানালাম।

পেশায় আমি ডাক্তার। ইংল্যান্ডে এসেছি ২০০৩ সালে। বাংলাদেশের ডাক্তারি পাশ করে লন্ডনে এলাম মাস্টার্স করবো বলে। ডাক্তারি করতে আমার খুব একটা ভালো লাগতো না; স্বপ্ন ছিল বিজ্ঞানী হবো। আমার বাবা বিজ্ঞানী। ছোট্টবেলা থেকে কেমিক্যালের গন্ধ শুঁকে বড় হয়েছি। কিন্তু বাবার ইচ্ছে আমি ডাক্তার হবো। তাই ভাবলাম এমন কিছু করি, যাতে ডাক্তারও হওয়া যায় আবার কিছুটা রিসার্চও করা যায়। বায়োসাইন্সে মাস্টার্স করবার পর বিজ্ঞানী হতে চেয়ে নানান ঝামেলায় ক্যারিয়ারের দুই বছর হারালাম। পরে ডাক্তারিতেই ফেরত যেতে হল। ক্যেমিকেলের গন্ধ শোকার স্বপ্ন, স্বপ্ন হয়ে থাকল বুকের গভীরে। আমি হয়ে গেলাম

হাসপাতালের একসিডেন্ট-ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার। ভাঙ্গা হাড় সোজা করি, সাপের বিষ নামাই, চুলকানি কিংবা কাশের ওষুধ দেই, নিভু-নিভু জীবনকে বিজলির ছ্যাকায় জীবনের আলোর পথ দেখাই। যাকে বল -'Jack of all trade, master of none.'

আমার বাবার আরো দুইটা পরিচয় ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং লেখক ছিলেন । মূলত বিজ্ঞান ভিত্তিক পাঠ্য বই লিখতেন, ছাপাতো বাংলা একাডেমি। বাবার বই লেখাতে সাহায্য করতে করতে আমারও লেখার সখ জন্মায়। এখন আমিও লিখি আর লিখতে ভালোবাসি। তবে আমার লেখা এখনো বই হতে পারে নাই। ডিজিটাল যুগের আমার লেখা ডিজিটাল মিডিয়াতে বন্ধুদের ক্ষণিক আনন্দ দিয়েই হারিয়ে যায়।

কাজের কারণে বাবার সঙ্গে বেশ কয়েকটি দেশে ছিলাম আমি ছোটবেলায়। এদেশেও এসেছিলাম। তখন আমার বয়স ৩-৪ বছর। ইংরেজি সন ১৯৭৭। বাবা পিএইচডি করতে তিন বছরের জন্য সাসেক্স ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন। ঐ ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসেই থাকতাম আমার মা, আমার বাবা আর আমি। আমার আর কোনো ভাইবোন নাই। মা গৃহবধূ। সে এক মজার মানুষ। চট করে রেগে ওঠেন। আবার তার রাগ ভাঙনোও খুব সহজ। দুইটা মিস্টি কথা বললেই বরফ গলে জল। তখন মায়ের ভূবন ভুলানো হাসি মুখ দেখার মতো।

'আমার সেই ৩-৪ বছর বয়সে সাসেক্স ইউনিভার্সিটির রাস্তা আমি ওয়ান-টু-থ্রি আর ABC লিখে ভড়ে ফেলতাম।'- মায়ের কাছে এই সব গল্প অনেকবার শুনতে শুনতে এটা আমার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে গেছে। এটাই আমার সবচেয়ে ছোটবেলার কথা যা আমার এখনো মনে আছে।

আমি যখন ক্লাস সিক্স-এ, বাবা তখন পাঁচ বছর মেয়াদী আরেকটা রিসার্চ প্রজেক্ট নিয়ে দিল্লী গেলেন। আমরাও সঙ্গে গেলাম। কিন্তু ১৫ মাস পরে ফিরে আসলাম সবাই, কারণ বাবার মনে হলো ভারতে থাকলে তাঁর ছেলের পড়ালেখা ভালোভাবে হবে না, ছেলেকে এইটের বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়াতে হবে। তা ছাড়া বাংলার শিল্প -সংস্কৃতির চর্চা দিল্লিতে বসে কি হয় কখনো?

দিল্লীর মানুষ হিন্দিতে কথা বলে। তবে আই আই টি (Indian Institute of Technology - যেখানে আমরা ছিলাম) তে নানান ভাষার ভারতীয় এবং বিদেশীদের অবস্থানও কম না। মনে আছে, আমার দু-জন বন্ধু তেলেগুতে কথা বলতো। আমার মতো তারাও হিন্দি জানতো না। ইংজিতে প্রতিদিন সকালে দোকান থেকে দুধ আনতে যেতাম।ঐ তেলেগু বন্ধুদের একজনের নাম ভাস্কার। তার ছোট ভাই টিংকু। টিংকু তখন ক্লাস থ্রিতে।টিংকু প্রতিদিন সকালবেলায় আমাকে জিজ্ঞেস করতো–ভাস্কর ইজ এ মিল্ক, আর ইউ এ মিল্ক? আমিও জবাব দিতাম–আই অ্যাম এ মিল্ক। ভাষা ভাব প্রকাশের মাধ্যম। কখনো কখনো জীবনের সহজ ধারায় সেই ভাষা ব্যাকারণের জটিল জাল ছেড়ে বেড়িয়ে পরে। তাতে ভাষার সৌন্দর্য ম্লান হয় না, বরং একটু বেশি মিস্টি মনে হয়।

আমি পড়েছি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে। বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো মেডিকেল কলেজ এটা। সেখানেই আমার বর্নাঢ্য ছাত্রজীবন। ছোটবেলায় পড়ালেখার খুব কড়াকড়ি ছিল বলে পারিপার্শ্বিক কোন কিছুতে আমি জড়িত হতে পারিনি। মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে সেই সুযোগ এলো। পুরো মেডিক্যাল জীবন সন্ধানী নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে রইলাম। ঐ সংগঠনের কর্মী থেকে জেনারেল সেক্রেটারি, তারপর প্রেসিডেন্ট। এখনো আছি উপদেষ্টা কমিটিতে। সন্ধানীর কাজ স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। দেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করবার জন্য আমরা নিজেরাই অনেকবার রক্ত দেবার জন্য শুয়ে পড়তাম, একে অন্যের রক্ত নিতাম। আমাদের এই সংগঠনের মূল কথা ছিল, বিনামূল্লে রক্তদানকে উদ্বুদ্ধ করা।

হাজার হাজার স্মৃতির ভিড়ে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মাঝ রাতে হলের বন্ধুদের ঘুম থেকে তুলে, নিজের পকেটের টাকায় রিকশাভাড়া দিয়ে সন্ধানীতে রক্ত দিতে নিয়ে প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা ছিল।পরদিন যখন জানতাম রক্ত যাকে দেয়া হলো সেই রোগী ভালো আছে, তখন অসম্ভব আনন্দ হতো। স্বেচ্ছাসেবীদের কাছ থেকে রক্ত নিয়ে মুমুর্ষের কাছে পৌছে দেয়ার যে আত্মতৃপ্তি - তার চেয়ে বড় সূখ আমি আর কিছুতে কখনো পাইনি।

অবসর তেমন একটা পাইনা। অনেকের মতো আমিও বাগান করতে, গান শুনতে, গল্প লিখতে, বই পড়তে ভালবাসি। শঙ্কর এবং তারাশঙ্কর আমার খুব প্রিয় লেখক। প্রিয় ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ। সেবা প্রকাশনীর অনুবাদ বই পড়তে পড়তে বড় হয়েছি। সেই সাথে পরেছি বঙ্কিম, শরত চন্দ্র এমন কি কালিদাশ রচনা সমগ্র। মনে আছে বাবা একবার Shakespeare - complete edition নিয়ে এল। শেক্সপিয়ারের ভাষা খূবই কঠিন। এক হাতে তার নাটক আর অন্য হাতে ডিক্সেনারি নিয়ে কয়েক ঘন্টা চেষ্টা করেছিলাম, আগাতে পারি নাই। এখনো বইটা শোকেসে সাজানো আছে। বইটার মলাটে শেক্সপিয়ারের ছবি। সেদিকে তাকালেই মনে হয় শেক্সপিয়ার আমায় নিয়ে এক ট্রাজিক কমেডি লিখতে বসেছেন।

চিকিৎসক হিসেবে আমার পেশাগত উদ্দেশ্য অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করা। কিন্তু সব সময়তো আর তা সম্ভব হয় না। চিকিৎসার সীমাবধ্যতা আছে। চিকিৎসক সেই সীমার বাধনে আবদ্ধ। তবে আমি মনে করি ভরসা দেয়া তো সব সময়ই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন আছে - জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এস। এমনকি কিছুক্ষণ পরে মারা যাবে এমন মানুষকেও ভরসা দিয়ে তার মনের কষ্ট লাঘব করা যায়। আর সেই প্রয়াস ডাক্তার হিসেবে আমাদের অত্যন্ত আবস্যকীয়। দুঃখের বিষয় এই যে - এটা আমরা অনেকেই মনে রাখি না।

বাঙালি মানুষের জীবনের গল্প ধরে রাখতে ন্যাশনাল সেন্টার ফর রাইটিং-এর এই উদ্যোগটি দুর্দান্ত একটি আয়োজন। আমাদের সবার গল্প আলাদা, ৫০ বছর পরে কিংবা ১০০ বছর পরে এসব গল্প আরো আলাদা শোনাবে। আমরা যখন শুনি শেরশাহের আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত, কত অবাক লাগে! এখন তো সের-মণের হিসেবটাই চলে গেছে। আগে রাজাদের নিয়োগ করা লেখকরা রাজার বিরত্ত গাঁথা লিখত। এ যুগের আমরা আমাদের গল্প লিখি।লিখি জীবনের গল্প।

এটা আমার গল্প। সূদুর বাংলাদেশে জন্মানো এক জনের বাংলাদেশ থেকে নরউইচে ঠিকানা গড়ার সত্য রূপকথা। এটি গল্প হলেও গল্প না।